চরমপত্রের মুকুল ভাই

লুৎফর রহমান রিটন

অটোয়া থেকে

এম আর আখতার মুকুল

১৯৭১ সালে দুটি কণ্ঠস্বর উদ্দীপ্ত রাখত ক্ষত-বিক্ষত রক্তাক্ত বাঙালি জাতিকে। দুটি কণ্ঠস্বরই প্রতিদিন ইথারে ভেসে আসত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে। একটি বঙ্গবন্ধুর। অনুষ্ঠানের নাম ছিল 'বজ্রকণ্ঠ'। অন্যটি এম আর আকখতার মুকুলের। অনুষ্ঠানের নাম ছিল 'চরমপত্র'। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে চরমপত্রের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। কী আশ্চর্য দক্ষতায় কণ্ঠস্বররেক আমূল পরিবর্তন করে কৃত্রিম একটা কণ্ঠস্বর প্রয়োগ করতেন তিনি! কণ্ঠস্বরটি ছিল অভিনব এবং নাটকীয়। সুস্পষ্ট এবং লক্ষ্যভেদী। রেডিওর ইতিহাসে 'চরমপত্র' একটি ব্যতিক্রম অনুষ্ঠাইন নয় শুধু, স্ক্রিপ্ট রচনা এবং পাঠের ক্ষেত্রে চরমপত্র একটি ইতিহাসও। চরমপত্রের ছিল কোটি কোটি শ্রোতা। এগারোটি সেক্টরের অধীনে সময়ের সাহসী সন্তান আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা লড়াই করেছেন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে। বিভিন্ন জোন-এ বিভক্ত হয়ে তাঁরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলেন সমস্ত বাংলাদেশ জুড়ে। একমাত্র মুকুল ভাই ছিলেন সেই ব্যতিক্রমী মুক্তিযোদ্ধা যিনি সবকটি সেক্টর এবং জোন-এ উপস্থিত থাকতেন। তাঁর ব্যাপ্তি ও বিস্তার ছিল সমগ্র বাংলাদেশ জুড়ে। মুকুল ভাইয়ের কণ্ঠ কাঁপিয়ে দিত হানাদার পাকিস্তানী বর্বর পশুদের চিত্ত। একদিকে শত্রুসেনা ও তাদের দোসর রাজাকার আলবদরদের মনোবলকে ভেঙ্গে তছনছ করে দিতেন তিনি, অন্যদিকে রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধা ও অবরুদ্ধ মুক্তিকামী জনগণ এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে আশ্রয় নেয়া এক কোটি বাঙালিকে দিতেন দুর্জয় সাহস আর স্বপ্ন দেখার প্রেরণা। বলতে গেলে চরমপত্র ছিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের একমাত্র ম্যাজিক যার দ্যুতিময় ম্যাজিশিয়ান ছিলেন এম আর আখতার মুকুল। আমাদের প্রিয় মুকুল ভাই।

একটি যুদ্ধে নানান রকম রণকৌশল থাকে। অস্ত্র হাতে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ না হয়েও কিভাবে একটি যুদ্ধকে পজিটিভ পরিণতির দিকে এগিয়ে নেয়া যায় সেটা দেখিয়ে ছিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র আর তার প্রণম্য কলা-কুশলীরা। এঁদের আমরা বলি শব্দ-সৈনিক। এই শব্দ সৈনিকরা আশ্চর্য সব মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে বিধ্বস্ত রক্তাক্ত সংগ্রামী মানুষদের জাগিয়ে রাখতেন। উদ্দীপ্ত করতেন। প্রেরণা যোগাতন শত্রু হননে। 'ওরা মানুষ হত্যা করছে, আসুন আমরা পশু হত্যা করি'- অবিস্মরণীয় এই পঙক্তিটি রচনা করেছিলেন কবি মুস্তাফা আনোয়ার। আর মুকুল ভাইয়ের 'চরমপত্র' তো ছিল একাত্তরে মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিকামী মানুষদের অনুপ্রেরণার হিমালয় পর্বত। বাংলার মুক্তিসেনাদের 'গাবুর মাইরেরর চোটে' 'ভোমা ভোমা সাইজের মছুয়াগুলা' যে 'চিক্কুর দিয়া' 'লৌড়' পাড়তাছে সেই খবর জানা যেত মুকুল ভাইয়ের কণ্ঠে। আহা, কী আশ্চর্য এক সময় এসেছিল আমাদের জীবনে। পাকিস্তানী বর্বর হানাদার বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করছে দেশের সাধারণ মানুষেরা। গুলতি দিয়ে একটা পাখি মারেনি যে যুবক, সে-ই কীনা হাতে তুলে নিয়েছে অস্ত্র- দেশমাতৃকার চরম দুঃসময়ে! জননী জন্মভূমিকে শত্রু হননে! আর তাঁদের প্রবলভাবে শক্তি-সাহস-প্রেরণা যোগাচ্ছেন মুকুল ভাই। গ্রামের বাড়িতে

রেডিও ছিল না সবার। যার বাড়িতে রেডিও নামক যন্ত্রটি ছিল- তার বাড়ির উঠোন ভর্তি হয়ে যেত সন্ধ্যায়, গ্রামবাসীর নিঃশব্দ আগমনে। মুকুল ভাইয়ের চরমপত্র শুনে তবেই না ঘুমুতে যাওয়া। 'ঠাস্ কইরা আওয়াজ হইলো। ডরাইয়েন না ডরাইয়েন না। আমাগো ঢাকার কুর্মিটোলায় বিচ্ছুগো আওয়াজ পাইয়া জেনারেল পিঁয়াজী সাবে চেয়ার থনে পইড়্যা গেছিলো!' মুকুল ভাইয়ের আজব কিসিমের এই রকম উপস্থাপনায় শত্রু অধ্যুষিত দেশে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত মানুষ। একটি মুক্তিযুদ্ধে অস্ত্রহাতে সম্মুখ সময়ে লড়াই করলেই চলেনা। প্রতিপক্ষের মোর‌্যাল ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়ে স্বপক্ষের যোদ্ধাদের নৈতিক ও মানসিক শক্তি যোগাতে রেডিওর মতো একটি গণমাধ্যমকে ব্যবহার করে মুকুল ভাই যে দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন তা এক কথায় অনন্য। একাত্তরে সাড়ে সাত কোটি বাঙালির মধ্যে মুকুল ভাইই ছিলেন এক এবং অদ্বিতীয় যিনি 'চরমপত্র' লিখতে এবং উপস্থাপন করতে পারেন। এই অসাধারণ কাজটি সম্পাদনের জন্য দ্বিতীয় কাউকে কল্পনাও করা যায়নি। এইক্ষেত্রে মুকুল ভাইয়ের তুলনা মুকুল ভাইইন। অন্য কেউ নয়। অদ্বিতীয় তিনি। তিনি অনন্য।

এই বিষয়টি নিয়ে কতো যে কথা হতো মুকুল ভাইয়ের সঙ্গে। বেইলি রোডের সাগর পাবলিশার্সে। প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় জমাট আড্ডা হতো সেখানে। প্রায়ই যেতাম আমি। শওকত ওসমান ছিলেন নিয়মিত। মাঝে মধ্যে পেয়ে যেতাম শ্রদ্ধেয় কলিম শরাফীকেও। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের চলমান ডিকশনারী ছিলেন মুকুল ভাই। কোনো একটি বিষয়ে সামান্য একটা টোকা দিলেই হলো- গড় গড় করে বলে যেতেন সেই বিষয়ের নেপথ্য সব কাহিনী। বিস্ময়কর সব তথ্য পেতাম তাঁর কাছে।

জন্মসূত্রে ঢাকাইয়া ভাষাটা আমার আয়ত্বে ছিল বলে মুকুল ভাইয়ের সঙ্গে আমার জমতো বেশ। সাগর পাবলিশার্সে গেলেই 'আহো মিয়া বহো বহো' দিয়ে শুরু করতেন। আমি বঙ্গবন্ধু, স্বাধীনবাংলা বেতারকেন্দ্র, চরমপত্র, তাজউদ্দিন, মোশতাক, জিয়া, এরশাদ, খালেদা, শেখ হাসিনা যে কোনো একটি সাবজেক্ট বেছে নিয়ে শুধু একটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেই হতো। মুকুল ভাই তাঁর স্মৃতির ভান্ডার থেকে গড়গড় করে বলে যেতেন অজানা সব কাহিনী। খোঁচা দিতাম- লিখছেন না ক্যানো এইসব কাহিনী। খোঁচাটা কাজে দিত- 'আরে মিয়া ডরাই নিহি কুনু হালারে . . . ল্যাখতাছি ল্যাখতাছি। সব লেইখ্যা যাইতাছি। পাইবা পাইবা। বহুত ইন্টারেস্টিং জিনিস পাইবা। হোনো মিয়া, বাংলাদেশে ফুলটাইম লেখক একজনই আছে। হেইড়া মুকুল। বাকী সবতে পার্ট টাইম রাইটার।'

- কীভাবে?
- 'বাকী সবতে ল্যাখে . . থাউক না, আমি আমারটা কই। আমি লেখি রোজ। ঘড়িতে টাইম ধইরা। প্রত্যেকদিন। ল্যাখনের সময় ক্রেন দিয়া টাইন্যাও আমারে কেউ তুলবার পারে না। রোজ কয় পৃষ্ঠা লিখুম সেইটাও হিসাব করা থাকে। টাইম টু টাইম, পৃষ্ঠা টু পৃষ্ঠা। এইটা আমার চাকরী'

মুকুল ভাই তাঁর চিরাচরিত ভাষায় কথা বলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। ১৯৯১ সালে টেলিভিশনে 'সৌরভে গৌরবে' নামে একটি অনুষ্ঠান আমি উপস্থাপনা করতাম। সেই অনুষ্ঠানেও মুকুল ভাইর সাক্ষাৎকার নিয়েছি। তিনি সেখানেও কথা বলেছেন তাঁর নিজস্ব স্টাইলে, নিজস্ব ভঙ্গিতে এবং নিজস্ব ভাষায়। খুবই কম্যুনিকেটিভ ছিল তাঁর ভাষা। দর্শক-শ্রোতা তাঁর কথা শুনতো বিমুগ্ধ বিস্ময়ে। শেখ হাসিনা তখন প্রধানমন্ত্রী। জাতীয় জাদুঘরে প্রধানমন্ত্রীর হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে চরমপত্রের মুল পান্ডুলিপি হস্তান্তরের আয়োজন করলেন প্রতিষ্ঠানটির তৎকালীন মহাপরিচালক শামুসজ্জামান খান। জাদুঘরের সভাপতি তখন অধ্যাপক মুস্তাফা নূরইল ইসলাম। পদাধিকার বলে তিনি সেই অনুষ্ঠানেরও সভাপতি। একমঞ্চে কৃতি দুই ভাই। দুজনই সুবক্তা। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুস্তাফা নূরউল ইসলাম বক্তৃতা করলেন সুললিত বাংলায়- 'আজগের এই অনুষ্ঠানে . . .।' কিন্তু কনিষ্ঠ ভ্রাতা এম আর আখতার মুকুল বক্তৃতা করলেন তাঁর স্বভাবসুলভ ভাষা ও ভঙ্গিতে, দেশের

প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতেই- 'যখন ছোটো আছিলাম, বাপে কইছিলো গরু চিনবি ল্যাঞ্জা ধইরা . . ।' জাদুঘর মিলনায়তন ফেটে পড়ল দর্শকদের অট্টহাসিতে। এই রকমই ছিলেন মুকুল ভাই। অকৃত্রিম। খাঁটি। সর্বত্র একই রকম।

মুকুল ভাইর সঙ্গে আমার শেষ দেখা ২০০১ সালের জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে। আমি তৃতীয় সপ্তাহে জাপান চলে যাচ্ছি টোকিওতে আমাদের দূতাবাসে প্রথম সচিব প্রেস হিসেবে যোগদান করতে। মুকুল ভাইর কাছ থেকে বিদায় নিতে সেই সন্ধ্যায় যথারীতি সাগর পাবলিশার্সে গেলাম। কলিম শরাফী সেদিন ছিলেন ওখানে। লন্ডনে আমাদের হাই কমিশনে মুকুল ভাই কাজ করেছেন। বেশ কিছু ইন্টারেস্টিং টিপস্ দিলেন তিনি আমাকে দূতাবাস এবং তার কার্যক্রম সম্পর্কে। কোন পরিস্থিতিতে কি করতে হবে চমৎকার ভাবে বুঝিয়ে বলছিলেন তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে। তাঁর দেয়া সব কটা টিপস্ প্রয়োগ করার সুযোগ পাইনি। তবে তাঁর একটা আগাম শঙ্কা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছিল। মুকুল ভাইয়ের সঙ্গে আমার একটা কাকতালীয় মিল রয়েছে। সেই সন্ধ্যায় মুকুল ভাই আমাকে বলেছিলেন- 'যাইতাছো যাও, মাগার আমার একটা ঘটনা মনে রাইখো। কামে দিবো। লন্ডনে যহন আমি প্রেস মিনিস্টার তহন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ঢাকায় বঙ্গবন্ধু খুন হইয়া গেলো। হের কয়দিন পরে লন্ডনে আমি শ্রমিক হইয়া গেলাম।'

মুকুল ভাইর সঙ্গে আমার কাকতালীয় মিলটা এখানেই। ২০০১ সালের অক্টোবরের সাঈদ-লতিফ-শাহাবুদ্দিনের ষড়যন্ত্রমূলক নির্বাচনে বিএনপি-জামাত চারদলীয় জোটের কাছে পরাজিত হলেন শেখ হাসিনা। এর কিছুকাল পরে, আমিও, মুকুল ভাইর মতোই শ্রমিক হয়ে গেলাম!

চরমপত্রের মুকুল ভাই, ০৯ আগস্ট আপনার ৭৬তম জন্মদিনে আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি।

অটোয়া, কানাডা ॥ ০৫ আগস্ট, ২০০৫

riton.bangladesh@gmail.com